প্রথম আলো

তারিখ ... 26 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

শিক্ষা ■ রোবায়েত ফেরদৌস

সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ চাই

২০০৯ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট চার লাখ ৪২ হাজার ৩৮৯ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন (*প্রথম আলো*, ২৩ আগস্ট ২০০৯)। এর সঙ্গে আছেন গতবারের এমন অকৃতকার্যেরা, যাঁরা কোনো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেননি। সব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিরাট এক ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন না কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে।

ভালো ফলের আনন্দ শিক্ষার্থীদের মনে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রত্যাশা তৈরি করে, মন্ত্রের মতো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারার বেদনা পরক্ষণেই তাঁদের মনে নিম্নমুখী হতাশার জন্ম দেয়। আর কেবল জিপিএ-৫ কেন, বাকি যাঁরা কষ্ট, মেধা প্রয়োগ করে দু-দুটি পাবলিক পরীক্ষার বৈতরণী পার হলেন, তাঁদের কী হবে? সব আশা-প্রত্যাশা কি থেমে যাবে? তা তো হতে পারে না। এখনে তাই রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি পড়তে চান না, তাঁর কথা আলাদা; কিন্তু যিনি শিক্ষাজীবনের সামনের উঠোনটা দেখতে পান, খানিকটা আরও সামনে হেঁটে যেতে চান, রাষ্ট্রের উচিত তাঁর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্নযাত্রা, উচ্চশিক্ষাই হতে পারে তাঁর প্রধান মাধ্যম। কাউকে বাদ দিয়ে এ স্বপ্নযাত্রা সম্ভব নয়, এ যাত্রায় সঙ্গী হবে প্রত্যেকে এবং সবাই।

দেশের মোট ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (যার মধ্যে আছে সাধারণ, প্রকৌশলী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো) অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আসন নির্ধারিত আছে মাত্র এক লাখ ৮৫ হাজার ৫৬৮টি আসন। ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন আছে দুই হাজার ২৬০; দেদার, টেক্সটাইল, কারিগরি ও বেসরকারি মেডিকেল মিলিয়ে আরও আছে চার হাজার আসন (*ডেইলি ক্যাম্পাস*, ২৭ জুলাই ২০০৯)। এর বাইরে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ হাজার আসন আছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, হাতে গোনা কয়েকটি বাদ দিলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগই সার্টিফিকেট বিক্রির বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের না আছে নিজস্ব ক্যাম্পাস, না আছে গ্রন্থাগার বা গবেষণাগার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বা খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে জোড়াতালির মাধ্যমে চলছে এসব। আমরা দেখছি, ভর্তি প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে উচ্চশিক্ষার নামে সনদ বিক্রেতা একশ্রেণীর ভুয়া, অযোগ্য ও অবৈধ প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন খবরের কাগজে চটকদার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোয় বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপনের যেমন কোনো বৈধতা দেশে নেই, তেমনি সুযোগ নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপনের। তাই বলে এ রকম প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ভিন্ন বহু নেই।

এর পরে বাকি থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সারা দেশে এর আওতায় সরকারি অনার্স কলেজ আছে ৪১টি, বেসরকারি অনার্স কলেজ আছে ২০টি, সরকারি মাস্টার্স কলেজ ৬১টি, বেসরকারি মাস্টার্স কলেজ ২৮টি, সরকারি ডিগ্রি কলেজ ১৩৯টি, বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ এক হাজার ৪৮টি (*কৃষ্ণচূড়া*, ৮ আগস্ট ২০০৯)। অঙ্কের হিসাবে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা বিপুল, মাথা গুনলে তা হয় এক লাখ ৬০ হাজার; দুঃখজনক যে এ কেবল বৃহৎ পরিমাণকেই নির্দেশ করে, কোনো গুণগত অনুষঙ্গ এখানকার শিক্ষার সঙ্গে যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এসব তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পঠন-পাঠনের মান, শিক্ষকদের যোগ্যতা, লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরির অবস্থা সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ থেকেছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেখানে সভা বা অদরকারি বিষয় খুলে এক সকালে নিজেদের 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' ঘোষণা করে দেয়, দেনদরবার করে সরকারি অনুমোদন বের করে নেয়। ব্যস ইহার পর আর কিছুটি করিবার নাই, মহা ধুমধামে তাহার কার্য চলিতে থাকে। কারণ, জাতিকে শিক্ষিত করিবার গুরুভার তাহার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে।

আমি মনে করি, কলেজকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা বা একটি ভালো কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার চিন্তাটিই একটি মস্ত বড় ভুল। এর মধ্য দিয়ে দুটি ক্ষতিসাধিত হয়—এক, ঘোষিত ওই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের 'হ্যাঙওভার' কোনো দিনই কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত আর উদার জ্ঞান-চিন্তার যে অবয়ব, গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির যে আকাঙ্ক্ষা, সেই সংস্কৃতি কোনো দিনই সেখানে গড়ে ওঠে না। দুই, কলেজ হিসেবে যা ছিল ভালো, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রি পর্যায়ের পঠন-পাঠনেও ধস নামে, আর অনার্স শিক্ষার কী হাল হয়, পাঠক তা জানেন। এ কারণেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এসব কলেজে ভর্তি হতে অনাগ্রহ দেখায়; কিন্তু তাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না।

তো এই যখন অবস্থা, তখন এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? কেউ কেউ সমাধান হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান বিভাগের আসনসংখ্যা বাড়ানো, দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বা দ্বিতীয় শিফট চালু করার প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু এগুলো ভালো কোনো সমাধান নয়। এর মধ্য দিয়ে বরং সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরও বহুবিধ সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে। কারণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা, অপর্যাপ্ত গবেষণাগার, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতার মতো শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অতীব জরুরি সমস্যা মোকাবিলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই এ ক্ষেত্রে বিকল্প প্রস্তাব হচ্ছে, সরকারকে বাংলাদেশের সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেহেতু এর সঙ্গে বিপুল অর্থের বিষয়টি জড়িত, তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে ১০-১৫ বছর মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

খসড়া হিসেব মতে বাংলাদেশের মোট ২৪টি জেলায় ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। অর্থাৎ ২৪ জেলায় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে ৪৫টি। খেয়াল করুন, বাকি ৪০টি জেলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ নেই। কোন জেলায় শিক্ষার হার কেমন, পথঘাট, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যপরিস্থিতি বা আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন— এসব বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যেসব জেলা ওই সব সূচকে পিছিয়ে আছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেখানেই সর্বাগ্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে হবে। এ জন্য বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ রাখতে হবে। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা কেবল উচ্চশিক্ষার বিষয় নয়, এর সঙ্গে জাতির স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিও জড়িত। মেডিকেল কলেজের শিক্ষা অনুষঙ্গ হিসেবে যেহেতু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু জেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মানও কিছুটা উন্নত হবে ধরা নেওয়া যায়। আমার জানামতে, বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করে বিবিএসের জেলাভিত্তিক রিপোর্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে জামালপুর ও পাইবান্ধাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের যে পরিকল্পনা সরকার নেবে বলে আশা করছি—এ দুটো জেলা থেকেই তার বাস্তবায়ন শুরু করতে পারে।

● রোবায়েত ফেরদৌস: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
robaet.ferdous@gmail.com